কাঁটার ফুল

কাঁটার ফুল

(গল্পোপন্যাস)

শ্রীসুধাকান্ত রায়-চৌধুরী প্রণীত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্‌ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

১৯২১

 [মূল্য ৸৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ।

ও

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ।

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কাঁটার ফুল

কান্তি—

সত্যি দিদি, মেয়েমানুষের প্রাণ বড় হাল্‌কা—ফুলের ঘায়ে মুস্‌ড়ে পড়ে—লজ্জা, উঃ কি লজ্জা, কোন্ মুখে তাঁর কাছে দাঁড়াব!

অমিয়া—

বোন, অতীতটাকে মুছে ফেল, যা হবার হ'য়ে গেছে, ফিরে আবার জীবনটাকে নতুন করে' গ'ড়ে তোল—এই রকমেই জীবন গড়ে।

কান্তি—

জানি দিদি—ভাঙা-গড়া জীবনের খেলা—তবু কেন এই রীতি যেন নারী-চরিত্রে খাপ্ খায় না। দুই কূলের মাঝখানে, দাঁড়াবার শক্তি আমাদের নেই।

অমিয়া—

যে কূল ভেঙে গেছে—তা'র কথা আর মনে ধরে' রাখিস্‌নে,—সমাজের মধ্যে যখন তোর প্রেমের আসন পেতেছিস্—তখন আর দোমনা না হ'য়ে—ঐ আসনেই সতী-লক্ষ্মী হ'য়ে স্থির হ'য়ে বোস্।

কান্তি—

পা'রি কই, কতবার ভাবি—দূর ছাই—অতীতকে আর ভাব্‌বনা। তবু দিদি পেরে উঠি না, ঘুরে ফিরে সেই ছবি চোখের আগে ভেসে ওঠে।

অমিয়া—

ভগবানের এই মর্ত্ত্য-রাজ্যে, কয়জনের আশা পূর্ণ হয়,—চোখ্ মেলে দেখ—চারদিকেই তো বুক-ভাঙা কান্না; তবু তারি মধ্যে শান্তি খুঁজে নিতে হয়—নইলে কি প্রাণ বাঁচে?

কান্তি—

সব বুঝি দিদি—তবু মন মানে না, মায়ের বুকের পিণ্ডসম ছেলে যখন মরে' যায় কি ভীষণ ব্যথাই মায়ের বুকে বাজে—তবু সে-ব্যথা ভুলে গিয়ে মায়ের মুখে আবার তো হাসি ফোটে। সব বুঝি, তবু অবুঝের মত, অশ্রু ফেল্‌চি। কেবলি মনে হচ্ছে বুঝি এতুঃখের আর অবসান নেই।

অমিয়া—

বোন, স্বামীরূপে যাঁকে দশ জনের মাঝখানে আলোবাতির শত শত প্রদীপের অগ্নির সাম্‌নে বরণ করেচিস্ তাঁর মনে কষ্ট দিস্‌নে।

কান্তি—

দিদি—যদি তাকে কষ্টই দেব' তবে নিজের বুকে এত কষ্ট পাই কেন! তা'র মনে পাছে কোন বেদনা জেগে ওঠে সেই আতঙ্কেই ত মরচি। তাই ত এই জ্বালা!

অমিয়া—

তাঁর পায়ে নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে ফেল্—সব জ্বালার অবসান হ'য়ে যাবে, শান্তি পাবি।

অনেক রকমে অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া অমিয়া আপনার স্বামীর বৈকালের জল-খাবার তৈয়ারি করিবার জন্য চলিয়া গেল। কান্তি শূন্য ঘরে মাদুরের উপর বসিয়া অশ্রুজলে কি ভাবিতে লাগিল। ছোট বেলা হইতেই কান্তি বড় কোমল-স্বভাব। আশৈশব তাহার মধ্যে কেমন একটি মাতৃ-ভাব জাগিয়া আছে। সকলকেই আপনার করিয়া লইতে তাহার একটুও বাধিত না। মাতৃত্বের আশ্চর্য্য অমৃত-ধারায় তাহার নারীচিত্ত এতটা ভর-পূর ছিল যে, সে কাঠিন্যকে মনের মধ্যে আমল দিতে পারে না।

কান্তির ছোট বেলার খেলার সঙ্গীদের মধ্যে, নৃপেন্দ্র ছিল একজন। এই যুবকটি লেখায় পড়ায়

—গল্পে খেলায় সদাই আনন্দে মাতিয়া থাকিত। বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ সে কান্তিকে পড়া বুঝাইয়া দিত। কান্তির পিতা মনোমত নৃপেন্দ্রকে আপনার ছেলের মতই ভাল বাসিতেন। কাজেই নৃপেন্দ্র হাসি গল্পে—সব রকমেই কান্তির সঙ্গে আপনার জনের মত মিশিত। এই মেলা-মেশার ভিতর দিয়া নৃপেন্দ্রের তরুণ হৃদয়টি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কান্তির দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল সে খবর নৃপেন্দ্র অনেক দিন পর্য্যন্ত টের পায় নাই। যেবার নৃপেন্দ্রের পিতা কয়েক মাসের জন্য ময়নাপুর ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বেড়াইতে গেলেন সেবার বাঁকীপুরে বসিয়া নৃপেন্দ্র টের পাইল তাহার তরুণ হৃদয়টি ময়নাপুরের একটি বৃহৎ তেঁতুল গাছের নীচের আটচালা বাড়ীতে মনোমত বাবুর কন্যার কাছে পড়িয়া আছে।

গ্রামের মধ্যে সাহসিকতার জন্য নৃপেন্দ্রের খুব

একটা নাম ছিল। দিনে, দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রিতে কেবল মাত্র একটি মীরজাপুরী লাঠী লইয়া ষোল বছরের স্কুলে-পড়া ছেলে নৃপেন্দ্র অবলীলাক্রমে শ্মশানে পাক দিয়া আসিত। মনে হইত বুঝি শ্মশানের ভূত—নৃপেনকেই ভয় করিত বেশী। যে বছর সে কুড়ি বছর বয়সে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিল সেই বছর শ্মশান হইতে একটি মড়ার মাথার খুলি আনিয়া বেশ সযত্নে নিজের পড়িবার ঘরে টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছিল। সেই মড়ার মাথার খুলি ঘরের মধ্যে টেবিলের পরে দেখিয়া কান্তি খুব ভয় পাইয়াছিল। মড়ার মাথার খুলি দেখিয়া ভয় পাইলেও সেইদিন হইতে নৃপেন্দ্রের পৌরুষ সম্বন্ধে কান্তি অনেকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। পুরুষের পৌরুষ নারীকে এবং নারীর সলজ্জ নারীত্ব পুরুষকে যে স্বাভাবিক নিয়মে আকর্ষণ করে ঠিক সেই নিয়মে নৃপেন্দ্র এবং কান্তি পর-

স্পারের নিকট একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া উঠিল। কান্তি এবং নৃপেন্দ্রের মধ্যে যে একতা পলে পলে গভীর হইয়া উঠিল সেই একতার অন্তরে একটা মঙ্গলের ভাব ছিল বলিয়াই সেই আকর্ষণ হঠাৎ নভেলি প্রেমের আহা-উহুর মত, অসংযমে উন্মাদ হইয়া উঠে নাই। এই রকমের একটি সরস ভাবে বন্দী হৃদয় বাঁকীপুরে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশ্য নৃপেন্দ্র সে চাঞ্চল্যকে কোন দিনও বাহিরে উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করে নাই।

বাঁকীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া নৃপেন্দ্র আপনার ঘরে বসিয়া কি একটা কেতাব পড়িতেছে—এমন সময় আঁচলের খস্‌খসানি—চুড়ির ঠুন্ ঠুন্—তাহার কাণে গেল; বই হইতে চোক তুলিয়া চাহিতেই দেখিল কান্তি তাহার ঘরের সমুখ দিয়া তাহার (অর্থাৎ নৃপেনের) মায়ের ঘরের দিকে গেল। নৃপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সটান নিজের মায়ের ঘরে

গিয়া উপস্থিত হইল। নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া কান্তি বলিল, "বাঁকীপুরে খুব ফুর্ত্তিতে ছিলে চেহারার অনেকটা বদল হয়ে গেচে।" হাসিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই খুব ফুর্ত্তিতে ছিলাম। কারণ গম্ভীর হ'য়ে বসে' থাকা আমার প্রকৃতি নয়।"

ছেলের এই কথা শুনিয়া মাতা স্নেহলতা বলিলেন, "অশান্ত প্রকৃতিকে এখন একটু শান্ত কর। বয়েস ত এই বাইস বছর হ'ল। যে রকম করে' হোক্ আগামী ফাল্গুনে বিয়ে দেব'।" মায়ের কথা শুনিয়া নৃপেন্দ্র বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"বিয়ে করা বড় খারাপ। কেবল বৌয়ের গোলাম সেজে থাক্‌তে হয়—ঐ দেখ না ওবাড়ীর ছোট দাদা বিয়ে করার পর থেকে সব রকমের আড্ডা আর গল্প ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে' থাকে। যদি-বা কখনো বারান্দায় আমাদের সঙ্গে দু একপাট দাবা খেল্‌তে বস্‌লেন অম্‌নি—বৌদিদি কোন্ ছক্কে ঘরের মধ্যে

দরজার কোল ঘেঁসে—ঝুন্ ঝুন্ করে' আঁচলের খুঁটে-বাঁধা চাবির গোচ্ছা বাজিয়ে যান—অম্নি দাদা উস্‌খুস্ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করেই অম্নি—এই আসি বলে' ঘরে ঢুকে পড়েন। আর সহজে বের হবার নামটি করেন না। আমরা মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি—ঘরে ঢোকবার মন্ত্র পড়চি না।

স্নেহলতা—

তুই বড় ফাজিল হয়েচিস্। সকলেই কি তোর ছোট দাদার মত বৌয়ের আঁচল-ধরা হয়।

কান্তি—

মিথ্যে কথা—বৌরা কখনো কাউকে ওরকম করে' আর আগ্‌লে বসে' থাকে না। তোমার ঐ রকম সব কথা।

নৃপেন্দ্র—

যাক্ ঘাট হয়েচে—মোদ্দা আমি বিয়ে কচ্চি না।

স্নেহলতা—

আচ্ছা যা এখন পড়া করগে—বিয়ে না হয় না কল্লি।

মায়ের এই শেষ কথায় অবশ্য নৃপেন্দ্রকে উঠিতে হইল। কিন্তু নৃপেন্দ্র আসলে নানা গল্পের বাহানায় কিছুক্ষণ কান্তির সাম্‌নেই থাকিতে চাহিয়াছিল। নিজের মধ্যে কোনদিক দিয়া কোন রকমের কোন অসংযম না আসে সেদিকে নৃপেন্দ্রের দৃষ্টি বরাবর ছিল। কাজেই সে উঠিয়া আপনার ঘরে আসিল।

(২)

কান্তি—

দিদি,—আমি মেয়ে মানুষ, নিজের মনের কথা এগিয়ে বলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—

অমিয়া—

ছুঁড়ি, তোরা পড়বি প্রেমে—আর আমি করব ঘটকালি। পারব না, বল্‌ কি বক্‌শিস্‌ দিবি ?

কান্তি—

দিদি,—তোমার জোরে কথা বল্‌বার বদ অভ্যাস ছাড়। গলাটা না হয় আমার কল্যাণে একটু খাটো কর। আশে-পাশে, মা বাবা মাসীমা পিসিমা রয়েচেন কারো কানে গেলে বিপদ!

অমিয়া—

বেশ কথা, দিব্যি আরামে নিরাপদে হেসে খেলেই বুঝি প্রেমে পড়তে হয়। আইদিদির গান মনে নেই?

সই—পীরিতির বড় জ্বালা লো
বড় জ্বালা।

কান্তি—

সত্যি দিদি—কি জানি কেন সেদিন সে অমন করে' হাঁ করে' এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল দেখে আমি মাথায় কাপড় দিয়ে চলে এলুম বটে—কিন্তু—

অমিয়া—

দূরহ ছুঁড়ি—কিন্তু আবার কি, বল্ না মুখ যদি ফুট্‌ল ত—বল্ বল্ শুনি—তখন তোর কি মনে হয়েছিল ?

কান্তি—

দিদি, সেদিন থেকে ওর সাম্‌নে বেরুতেই লজ্জা করে। ওরকম ভাবে চারচোখে চাওয়া কোন-দিন হয়নি। কি বেলাহাজ বল্ ত ?

অমিয়া—

বোন, নৃপেন্দ্র বড় সাবধানী। সহজে অমন ভাবে আত্মহারা হ'য়ে তাকিয়ে থাকার ছেলে সে নয়। তবে কি জানিস্—হাজার হোক—তবু সে পুরুষ। মনের ধড়ফড়ানি আর কতক্ষণ চেপে রাখ্‌বে ?

কান্তি—

চাইতে বারণ করে কে, তাই বলে' দিদি অমন

করে' সকলের সাম্‌নে চেয়ে থাক্‌বে—বড় লজ্জা দিছ্‌ল! ছিঃ!

অমিয়া—

সেই চাওনিটা, লজ্জাই দিক্‌—আর সরমই দিক—তবু তাতে তুই মনে মনে খুসী ত হয়েছিলি।—এতদিনের মনের টান;—মুখে না বল্লি—চোখেই না হয় প্রেমের কথা বল্লি।

কান্তি—

ঐ দিদি—ঐ দেখ্‌ আবার আস্‌চে, আমি যাই, তোর খুকীর জামা সেলাই করিগে।

অমিয়া—

বাঃ মজা ত বেশ। বোস্‌ ছুঁড়ি! আস্‌চে-বেচারা তোর চাঁদমুখ দেখ্‌তে—আর তুই চল্লি খুকীর জামা সেলাই কর্ত্তে।

কান্তি—

ছাড় দিদি—কি করচ—আমার বড় লজ্জা করে।

অমিয়া—

ন্যাকামি ছাড়্—লজ্জা করে ;—আবার দেখ্তে না পেলেও ত কম উস্খুস করিস্ নে।

কান্তি ও অমিয়ার রসালাপে বাধা দিয়া হঠাৎ নৃপেন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিল—"অমিয়া দি, চুরি-করে' মায়ের বাটা থেকে একটা নয় ছুটো নয় একেবারে তিনটি পান মুখের মধ্যে পুরে দিছ্লুম—চুরির শাস্তি পেতে আর দেরী হ'ল না। চুণে মুখ পুড়ে গেছে—দাও একটু খয়ের দাও।" এই কথায় অমিয়া একটু মুচ্কিয়া হাসিয়া কান্তির হাতে আলগোছে একটি চিম্‌টি দিয়া বলিল,—"কান্তি! যা বাটায় থেকে একটু খয়ের নিয়ে আয়।" কান্তি একটু খয়ের আনিয়া একটি ছোট কাগজের উপর তাহা নৃপেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া দিল। নৃপেন্দ্র চট্ করিয়া তাহা মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। কিছুক্ষণ বাদে গল্প করিয়া নৃপেন্দ্র কান্তির দিকে চোক

তুলিয়া বলিল, "কান্তি, হঠাৎ পড়া শুনা বন্ধ করে' দিলে—এই তোমার বিদ্যানুরাগ।"

এই কথার জবাব দিবার জন্য কান্তি চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কেমন একটু লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া হাতের বুড়া আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। অসাবধানতা হেতু মাটিতে বুড়া আঙুলের চাপ জোরে দেওয়ায় ডান হাতের চুড়ি ঠুন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। সেই ঠুন্ ঠুন্ শব্দে নৃপেন্দ্র কতটা মুগ্ধ হইয়াছিল বলিতে পারি না! অন্তত সেই শব্দে কান্তির নিজের মন চমকিয়া উঠিল—মাটি হইতে হাত তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে তাহার এক-রাশ কালো চুলের কয়েক গাছা তাহার চোখের উপর উড়িয়া পড়ায় সে হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেই আবার হাতের চুড়ি ঠুনুন্ঠুন্ বাজিয়া উঠিল। কান্তি আবার সাবধান হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে নৃপেন্দ্র চলিয়া গেলে, অমিয়া মৃদু হাসিয়া কান্তির

আঁচল টানিয়া বলিল, "ছুঁড়ি, তুই বড় সয়তান। মুখে কথা বল্লি না—কেবলি চুড়ির বোলে নৃপেন্দ্রের মন কাঁপালি।

কান্তি—

সত্যি দিদি! যখনি এক একবার অসাবধানে চুড়ি দুটো ঐ রকম বেজে উঠ্‌ছিল তখনি আমারি কেমন লজ্জা কচ্ছিল।

অমিয়া—

বেচারার পড়া শুনা দেখচি্ এইবার মাটি হবে! —খয়ের চাইতে এল এই বাড়ী। যে বাটায় পান চুরি করেছিল সেই বাটায় ত খয়ের ছিল।

হঠাৎ এমন সময় সদা-আনন্দিতা সেই সঙ্গে সরসরসিকা কান্তির মাতামহী (যিনি এতক্ষণ বেড়ার আড়াল দিয়া পাশের ঘরে বসিয়া নাত্‌নিদের রসের গল্প শুনিতেছিলেন) তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন—"ওলো

দিদিমণিরা, যে বাটায় মনের পান চুরি হয়েচে সেই বাটায় খয়ের চেয়েচে—বুদ্ধিমানের কাজই করেচে—প্রেমিকের কাজ করেচে।” হঠাৎ দিদিমার মুখে এই কথা শুনিয়া কান্তির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। অমিয়া থতমত খাইয়া নিজেকে একটুকু সাম্‌লাইয়া বলিল, “দিদিমা তোমার দুটি পায়ে পড়ি —খবরদার এসব কথা কাউকে বোলোনা। আমাদের মাথা খাও যদি বল।”

দিদিমা—

তবে বল্‌ আমার কথা রাখ্‌বি।

অমিয়া—

একশবার রাখ্‌ব।

দিদিমা—

চট্‌পট্‌ কান্তির আঁচলের সঙ্গে নৃপেন্দ্রের কোঁচার খুঁটে গেরো দেবার বন্দোবস্ত করে’ ফেল্‌।

কান্তি—

দিদিমা, তুমি ভারি দুষ্টু। কেবল ঐ সব।

দিদিমা—

দুষ্টু নাতিন্ আমার,—লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমের মধু চাখবার চেষ্টা—তা হচ্চে না, সতীন্ হয়ে তোর প্রেমে ভাগ বসাব। ভেবেচিস্ কি—বাসর ঘরে নাতজামাইয়ের ডানদিকে আমিও কোল বালিস হয়ে শুয়ে থাক্‌ব।

(৩)

বিমলা—

মা, কান্তি ত নৃপেন্দ্রকে অনেকটা মনে মনে ধরে' বসেচে।

দিদিমা—

তোদের শাস্ত্র আর পাঁজীপুঁথি গঙ্গার জলে ফেলে দে—ও বালাই রাখিস্‌নে। গণের মিলের চেয়ে মনের মিল অনেক বড়। ওর সঙ্গেই বিয়ে দে।

বিমলা—

ভেবে দেখ মা, রক্ত মাংসের টানের উপর দিয়ে সমস্ত জীবনের ভাবী কল্যাণ যেন নষ্ট না হয়।

দিদিমা—

দেখ্ বিমল! মেয়ে পুরুষ দেখে দেখে আজ আমার এই নারী-জীবনের বয়েসটা কম হ'লেও অন্তত সত্তর। প্রেমের কোন্‌দিক্ উচ্ছৃঙ্খল আর কোন্ দিক্‌টা মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত সেটা বেশ বুঝি। যেখানে মনের মিল হ'য়ে বিয়ে হয় সেই খানে শাস্ত্র বড়—সেইখানে শাস্ত্র গৌরবের সঙ্গে বিবাহের অনুষ্ঠানের কৃত্যকে সমাধা করে। যেখানে মনের মিল নাই অথচ বিয়ে—সেটা অধিকাংশ সময়েই মনে এক—কাজে আর একের ব্যভিচার ঘটায়।

বিমলা—

তা বুঝ্‌লুম। কিন্তু সমাজকে ত আর অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারি না।

দিদিমা—

মঙ্গলের জন্যেই ত মানুষ সমাজের সৃষ্টি করেচে —অমঙ্গলের জন্যে নয়। কাজেই, ব্যক্তিগত জীবনটাও যদি সত্যিকার মঙ্গলে গড়ে ওঠে তবে সেই সঙ্গে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

বিমলা—

এ বিয়ে হ'লে সমাজে যে আমাদের একঘরে কর্ব্বে।

দিদিমা—

তা কি কর্ব্বি বল ? সমাজের ইজ্জতের চেয়ে কি মানুষের প্রাণ ছোট ? তাই যদি হয় তাহলে কান্তিকে মেরে ফেলেদে। আপদ বালাই সব চুকে যাক্।

বিমল—

ভগবান ভরসা। দেখি উনি কি করেন। ওঁর বন্ধু হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ত এই বিয়ের ঘোর বিরোধী।

দিদিমা—

কলির অধর্ম্ম। তাই ভট্টাচার্য্য সত্য-শাস্ত্র ত্যাগ করে টিয়ে পাখীর রামনাম পড়ার মতন পুঁথির কতগুলি বোল মুখস্থ করে রেখেছে। কান্তির বাপকে একবার জিজ্ঞেশ করিস তো—স্ত্রী বেঁচে থাক্‌তে হিন্দু জাতির কোন শাস্ত্র মতে সে আবার বিয়ে কল্লে।

বিমলা—

তাতে আর দোষ কি, হিন্দু শাস্ত্রেই বরং বহু বিবাহের আইন আছে।

দিদিমা—

স্ত্রী যদি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়—তাহলে এক স্ত্রী ছাড়া দুই স্ত্রী হলে স্বামীর অস্তিত্ব থাকে কই, দুই স্ত্রীতেই তো আধে আধে একটা পূর্ণ হয়ে গেল।

বিমলা—

ছাই মাথা মুণ্ড আমি ও শাস্ত্র বুঝিনা, সবটারই

এক একটা ব্যাখ্যা গরুর ল্যাজের মত লেগে আছে। এমন ব্যাখ্যার শাস্ত্রও বাবা দেখিনি।

দিদিমা—

তাই বলি ও ব্যাখ্যার শাস্ত্র ছেড়ে সত্য শাস্ত্রে নির্ভর করে, নৃপেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দে। অনর্থক একটা বিভ্রাট ঘটাস নে। কেবল নাক মুখ চোক বুঁজে শাস্ত্র মেনে মেনেই ত সমাজে অধর্ম্মের এমন ব্যাভিচার হচ্ছে।

দিদিমার সহিত তর্কে আঁটিতে না পারিয়া বিমলা (কান্তির মা) রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এই দিদিমা বয়েসে সেকেলে হইলেও বুদ্ধি শুদ্ধি নিতান্ত পক্ষে একেলে ছিল। দিদিমা একেলে ভাবে চিন্তা করিতেন বলিয়া সেকেলে বুড়ি গিন্নিদের মহলে তিনি বড় বেশী আমল পাইতেন না। অথচ একেলে একেবারে পাখনা ঝাড়া উদীয়মান সাহেব বিবিদেরও তিনি দুই চক্ষে দেখিতে

পারিতেন না। বিবি সাজিয়া হট হট করিয়া মেয়েরা পুরুষের গা ঘেসিয়া ট্রেনে ট্রামে বসাটাকে তিনি শুধু অন্যায় মনে করিতেন না—বিশ্রী রকমে ঘৃণা করিতেন। কোন এক ইংরাজী নবীস্ একদিন দিদিমাকে বেশ যুক্তি তর্কের জাল পাতিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, ডাইভোর্স প্রথাটা স্ত্রী এবং পুরুষের তরফ হইতে ভাল এবং মঙ্গলকর। আর বিবাহ ব্যাপারটা, কনট্যাক্ট আইনের মতই হওয়া বাঞ্ছনীয় যেহেতু ইহাতে সর্ব্বদিক হইতে ব্যক্তিস্বাধানতার মার্গ সতত প্রসস্থ থাকে। ইংরাজী-পড়া নব্য ছোকরার এই কথা শুনিয়া দিদিমা সেদিন বড়ই রাগিয়া বলিয়াছিলেন "এই রকমের ব্যক্তিস্বাধীনতা জঙ্গলের বর্ব্বরদের জন্য— মনুষ্যসমাজের জন্য নহে।

এক কথায় দিদিমা হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যেটা সত্যিকার জ্ঞানের দিক সেটাকে, সর্ব্বতো ভাবে

মানিতেন। যেখানে সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপরতার জন্য অথবা বিশেষ কোন একজনের সুবিধার জন্য সত্যের পথ ছাড়িয়া কুব্যাখ্যার সদর রাস্তায় নামিয়াছে —সেই খানেই তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বিমুখ। এই জন্য, নব্য সমাজ যখন দেখিত তিনি, মাছ মাংস না খাইয়া দেশী বিধবার মত সাদা ধুতি পরিয়া যথারীতি সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন—তখন তাহারা হাসিত, কোন কোন যুবক বিবরলে তাঁহাকে ম্যাড্ক্যাপ্ বলিয়াও বিদ্রূপ করিত। আবার যখন দিদিমা সমাজের কু-প্রথার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া যাইতেন তখন, সাবেক দলের লোকেরা নাক সিটকাইত।

যাহোক এই রকম একটি রক্ষণশীলা, সমাজ সংস্কারক দিদিমার কাছে কান্তি, অবাধে এবং বেশ সহজে নিজের মনের সব কথা বলিত। দিদিমা যেমন কান্তির সখী ছিলেন—আবার তেম্নি কান্তির মনে সৎশিক্ষা দানের বেলায় তিনি গুরুও ছিলেন।

ক

বিবাহের লগ্ন যতই সন্নিকট হইয়া আসিল ততই কান্তির বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে উৎসবের হাসি আর আনন্দ, তার মাঝখানে কান্তির মনে কি দুঃখের অগ্নি জলিতেছিল তাহা কেহ টের পাইল না। দিদিমা এক মাস আগেই অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন। এখন কে এই বিপদ ঝঞ্ঝা হইতে কান্তিকে রক্ষা করিবে?

অমিয়া সারাদিন কাঁদিয়া যখন আর পারিল না একেবারে মরিয়া হইয়া কান্তিকে ঘরের কোন হইতে টানিয়া বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "বোস মৃত্যুর হাত কেউ এড়ায় না—মরন একদিন নিশ্চিত। চল বোন পুকুরে ঝাঁপ দিবি। একমুহূর্ত্তে কান্তির প্রাণের ভিতর বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মরা ধড়ে প্রাণের আবেগ সঞ্চার হইল সে বলিল "দিদি আজ এই শুলগ্নে মরণের কণ্ঠেই তবে বরমাল্য পরাইয়া

দি সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইয়া যাক্।” বজ্র কঠোর স্বরে পিছন হইতে কে আসিয়া বলিল ন্যাকা কান্না ছেড়ে দে—বিয়ের সময় হল এখন ওঠ। বিমলা জিবে কামড় দিয়া বলিলেন “কান্তি বিয়ে হয়ে গেলে বিষ খেয়ে মরিস এখন আমাদের ইজ্জত বাঁচা দশ মাস অনেক কষ্টে পেটে ধরেছি এমন করে আর মজাসনে।

একসঙ্গে পিতা এবং মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া কান্তিক চোখের জল মুছিয়া হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হইয়া গেল। রক্ত মাংসের শরীর মুহূর্ত্তের মধ্যে যন্ত্রের মত হইয়া গেল।

যথা নিয়মে বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে বর বধূকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবার জন্য সকলেই আসিল। আসিল না কেবল অমিয়া। সে তখন মঙ্গল উৎসবের মাঝখানে আপন স্বামীর কক্ষে অমঙ্গলের অশ্রু ফেলিতেছিল। নব বিবাহিত কেশবলাল স্ত্রীকে একান্ত

বিমর্ষ দেখিয়া নিজেও গম্ভীর হইলেন। অন্যান্য অল্প বয়সের মেয়েরা বাসর ঘরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া একে একে সব সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

খ

শ্রীচরণেষু,

দিদি! এইত এতদিন শ্বশুরবাড়ী আছি—এখনো স্বামীর সঙ্গে একটি বারও আলাপ হয়নি। দূরে দূরেই আছি। উনি দু একদিন আদর করেই কাছে ডেকেছেন তবু যাইনি। শেষটায় উনি বিরক্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘরের মধ্যে শুতে যাই—থাকি স্বতন্ত্র শয্যায়। স্বামী ভাবচেন এটা আবার কেমন ধারা। ইতি মধ্যেই কেউ কেউ আমার ভূত ঝাড়াবার জন্যে সাদা সরষে কেনবার জন্যে শ্বশুর মশায়কে পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ কেউ আমার মেজাজ একরোখা বলে আমায় ঝ্যাঁটা-পেটা

করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দিদি, আর ত সয় না। যা হয় একটা করতে হবে। এরকম করে মনের বোঝা আর কত দিন বইব। কেমন থাক লিখো।

অভাগী কান্তি।

(৪)

অমিয়া—

তোমার কি অভিপ্রায় এখন, কান্তির যা হবার তা হয়েচে। তোমার জীবনটাকেও কি মাটি কর্ব্বে?

নৃপেন্দ্র—

দিদি, মাটি নয়। জীবনের উপরে সাত্য কার অগ্নি-পরীক্ষা সুরু হয়েচে। হয়ত এই ঘটনার ভিতর দিয়েই যা সত্য তাই ফুটে উঠবে।

অমিয়া—

দেখ, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েদের ধরণ কতকটা

বুঝি। যদি সত্যই কান্তির জীবনকে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তা হলে এক কাজ কর—তুমি আস্তে আস্তে রয়ে সয়ে কান্তিকে বুঝতে দাও যে তুমি তার সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্বন্ধ ছিন্ন কর্বে।

নৃপেন্দ্র—

দিদি—সম্বন্ধ যা হয়েচে সেত ছিন্ন হবার মত নয়। বরং সম্বন্ধ যতই সত্য হবে আমার বিশ্বাস কান্তিকে ততই মঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাবে।

অমিয়া—

দেখ ভেবে। এ জায়গায় অবিশ্যি উপদেশ কাজ করেনা। কিন্তু কান্তির অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে গেল। কোন উপায় নাই যে তোমার সঙ্গে আর মিলন হবে।

নৃপেন্দ্র—

দিদি ওকথা আর মুখে এননা। চোখের জলে

মিলনের আশা ভেঙ্গে গেছে—প্রার্থনা করি নির্ম্মল হাসির তরঙ্গে সেই মিলন কান্তি স্বামীর ঘর লাভ করুক। আমার কাছে ও কল্পনা বড় জঘন্য মনে হয়।

হঠাৎ নৃপেন্দ্রের মুখে এত বড় একটা নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া অমিয়া প্রথম কেমন একটু চমকিয়া উঠিল—পরক্ষণে, ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। ভাবিল ছিঃ পুরুষজাতি এম্নি ক্ষণ প্রেমী, যাহার জন্য কান্তি বুকে দুঃখের দাবাগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া আছে—সে আজ এক মুহূর্ত্তে কান্তির সব বন্ধনকে অস্বীকার করিতেছে। অমিয়াকে স্তব্ধ দেখিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "দিদি, আজ আসি, পরে দেখা কর্‌ব। তবে কান্তির সম্বন্ধে আর কোন কথা আমায় বোলনা। যা হলনা, তা নিয়ে জীবনটাকে প্রতিদিন বিড়ম্বিত করা কোন কাজের কথা নয়। বিড়ম্বনা জীবনের ধর্ম্ম নয়। মঙ্গলই হচ্ছে সবটার উপরে।

অমিয়া—

তাই হোক। কিন্তু মুখের কথায় যেটা সহজ, কাজে সেটা বড় কঠিন।

নৃপেন্দ্র—

তা কি জানিনা দিদি। তবু যা শ্রেষ্ঠ তাইত নেবার চেষ্টা করতে হবে। থাক, আজ আসি। পারিত পরে দেখা কর্ব্বি।

(৫)

ক

কল্যাণীয়াসু।

বোন, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিস্‌নে। মানুষের সফলতা সেই খানে যেখানে মানুষ প্রতিদিন মঙ্গলের সাধনায় নিজের ছোট খাট দুর্ব্বলতাকে জয় করে। প্রেম জিনিষটা ছোট নয়—সেটা খুব বড়। তার বৃহৎ রূপকে যেদিন উপলব্ধি করবি সেই দিনই দেখবি দেহের ভোগ সেটা ছোট হয়ে যায়—প্রীতিটা পূর্ণ

রূপে সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। সেই বড় প্রীতির রাজ্যে তুই সকলকে সমান দেখবি। তোর কোন দৈন্য থাক্‌বেনা। ভেবেনে সংসারে ভোগের রাজ্যে এজন্মের মত অধিকার নেই—পরজন্মে হয়ত সে রাজ্যের যেটা কাম্য সেটা পাবি। আমার বিশ্বাস, মানুষ এক জন্মে সব দিকের পূর্ণতা পায়না—সবদিকের গ্রহণীয় যা তা ভোগ করে উঠতে পারে না। এই জন্মে যা পেলিনা, পরজন্মে পাবি। জন্মে জন্মে কেবলি পূর্ণতাকে অংশে অংশে কেবলি সঞ্চয় করাই মানুষের ধর্ম্ম।

সকল দুঃখের উপরে তোর জীবনের মঙ্গল সাধনা ধন্য হউক। এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি

তোর দিদি।

খ

কেশব লাল—

কান্তি, অনেক দিন ত অপেক্ষা করে রইলুম।

এখনো কি ধরা দেবে না? থাক্, বন্দী কর্ত্তে চাইনা। কিন্তু তোমার মুক্তি কিসে সে খবরও তো আমায় জান্‌তে দিলেনা?

কান্তি—

সে খবর তোমার পক্ষে শোনা কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও কঠিনতর সেটা আমার পক্ষে তোমার কাছে বলা।

কেশব—

তবে থাক্ কান্তি, আরো কিছুদিন সময় দাও, রক্ত-মাংসের শরীর আমার। ভাল মন্দকে স্থির ভাবে গ্রহণ করে নেবার মত আজো তেমন ভাবে কোন সাধনা করিনি। তবে একটা কথা! পার্ব্বে কি সেটা সইতে?

কান্তি—

সব কিছু সইবার জন্যই বোধ হয় আমাদের জন্ম। অন্তত সইবার ধাক্কাতেই আমার জীবনে এত বেদনা।

কেশবলাল—

দোহাই তোমার কান্তি, জীবনের যৌবনে কেবলি আশা করেছি আমার বিবাহিত জীবনে সুখী হ'ব। আমার সে সুখ কল্পনায় বজ্র নিক্ষেপ করোনা। তোমরা নারী,—মাতৃত্বের পুণ্যধারা তোমাদের অন্তরের সামগ্রী—তোমারা দুঃখতাপের মাঝখানে চির-কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী—তোমরা লক্ষ্মী—তোমার তরফ থেকে যেন আমার বুকের উপর কোন রকমের বজ্র না আসে।

কান্তি—(অশ্রু মোচন করিয়া)

ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। আমি লক্ষ্মী নই—আমি মাতা নই—আমি, পাপী। জগতে পুড়তে এসেছি—পোড়াতে এসেছি।

কেশব—

তবে সেই কথা শোন, তুমি আমায় ছাড়। একটা কর। নয় আমায় গ্রহণ কর—নয় আমায়

ছাড়। এরকম সমস্যার মাঝখানে আর থাক্‌তে পারিনা!

কেশবের এই কথায় কান্তি আর থাকিতে পারিল না। তাহার মনের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল। সে ত চিরকাল সকলকে ভালবাসিয়াছে, সেই জন্যই ত.—সমাজের স্বামীকে মনের মধ্যে আসন দিতেছে—ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে সমস্যা হইতে সমস্যান্তরে লইয়া গিয়া কেবলি বিপথের অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। সেই জন্যই তো—কেবলি অমিয়ার কাছে বার বার ধন্না দিয়া আসিয়া পড়িতেছে।

বাপের বাড়ী আসিয়া অবধি কান্তি কেশবের নিকট হইতে কম পক্ষে পাঁচখানা চিঠি পাইয়াছে কিন্তু একটিরো জবাব দিতে পারে নাই—দিবেই বা কোন লজ্জায়! অথচ কেশবের দেবচরিত্র, নিজের প্রতি (অর্থাৎ কান্তির প্রতি কেশবের) তাহার একান্ত

নির্ভর এবং বিশ্বাসও কান্তিকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—তাই যখন অমিয়া বলিল "তাঁর পায়ে নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে ফেল" তখনি কান্তির ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল।

নৃপেন্দ্রকে সে যে ভালবাসা দিয়াছিল সেটা ত এখনো বুকের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। অন্যদিকে আবার কেশব নূতন মোহের জাল পাতিতেছে। কোমলপ্রাণা কান্তি বড় সমস্যায় পড়িল। নিজের মনের ভাল মন্দের সঙ্গে বিচার করিতে করিতে কান্তির জলভরা চোখের পাতার উপর নিদ্রার তন্দ্রাভার নামিয়া পড়িল।

স্বামীর জলখাবার তৈরী করা শেষ করিয়া অমিয়া কান্তির ঘরে আসিয়া দেখিল, কান্তি মাদুরের উপর ডান হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—চুলগুলি খোলা। কি সুন্দর মুখ—বেদনার মলিনতায় ফ্যাকাশে চোখের কোলে তখনো

অশ্রু সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া অমিয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার চোখে প্রবল অশ্রু আসিল—খুব কতকটা অশ্রু ফেলিয়া অমিয়া আঁচলে চোক মুছিল। মনের মধ্যে কেমন একটা বিরুদ্ধভাব জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নিজের মনেই বলিল "ধর্ম্ম, সমাজ, শাস্ত্র সব যাক্—যাক্ চুলোয়। যাক ছুঁড়ি নৃপেন্দ্রের সঙ্গেই কোথাও বাহির হইয়া যাক"—পরক্ষণে, জীব কামড়াইয়া বলিল "ছিঃ ছিঃ একি কথা বলিলাম। অকল্যাণ—অকল্যাণ। একি করিলাম,—ভগবান রক্ষা কর। শত অপরাধ ক্ষমা কর। —রমণীর যাহা গৌরব কান্তিকে সেই গৌরবে বড় কর, তাহার নারীজন্মের সফলতায় বজ্র হানিওনা।

সন্ধ্যায় যখন কান্তির ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে তখন সসব্যস্ত হইয়া দিদির রান্নাঘরের চৌকাটে গিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে রান্না-

ঘরের পাশে ভাঁটগাছের জঙ্গলে খস্ খস্ করিয়া উঠিতে অমিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দেখিলেন অদূরে নৃপেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে। নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া অমিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া ইঙ্গিতে নৃপন্দ্রকে ডাকিল। নৃপেন্দ্র রান্না-ঘরের পিছনে আসিয়াছে জানিয়া কান্তির মনে সমস্যার তরঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। একবার ভাবিল ছুটিয়া গিয়া নৃপেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে "আমায় বাঁচাও —আমায় লইয়া যাও, এমন করিয়া আরত পারিনা!" পরক্ষণে কেশবের স্নিগ্ধশান্তমুখচ্ছবি তাহার মাতৃত্বে ভরা হৃদয়ের দ্বারে বার বার উঁকি মারিতে লাগিল। একা নারী এমন করিয়া দুই টানের মাঝখানে কতক্ষণ থাকিবে। বুক ভাঙ্গিয়া অশ্রুজল তাহার চক্ষুকে ভরিয়া তুলিল, বার বার আঁচল দিয়া সে চোক মুছিল। ক্রমশ, অমিয়া আসিয়া বলিল "কান্তি নৃপেন্দ্র একবার দুটি কথা বলিতে চায়—চল ওঠ্!"

দিদির এই অনুরোধ কান্তির মনের উপর একটা বোঝার মত চাপিয়া বসিল। পায়ে পায়ে যেন সঙ্কোচের শৃঙ্খল পড়িয়া গেল। বুক দুর দুর কাঁপিতে লাগিল। দিদির কথার কোন জবাব না দিয়া সে মাথা নিচু করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। দিদি অনেক মিনতি করিয়াও কান্তিকে রান্নাঘরের চৌকাট হইতে নড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা সে নৃপেন্দ্রকে বলিল "তুমি একবার না হয় মুহূর্ত্তের জন্য ভিতরে এস।"

নৃপেন্দ্র—

না দিদি যাক্। দেখা করায় যখন এত বাধা এসেছে তখন আর দেখার প্রয়োজন নেই। সম্বন্ধটা এই রকম করে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক।"—

এই বলিতে বলিতে নৃপেন্দ্রের কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। রুমালে চোখ মুছিয়াই সে আর কিছু না বলিয়া হঠাৎ সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অমিয়া নৃপেন্দ্রের চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া সেই দাওয়ায় দাঁড়াইয়া রহিল;—তখন ভাঁটবনের উপরে একসার আমগাছের মাথায় অন্ধকারের পর্দ্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হইল। বেড়ার ফাঁক দিয়া তাহারি কিরণ-রশ্মি কান্তির বেগুনি-বর্ণের সাড়ীর ঘোমটার ভিতরে—কান্তির মুখ পদ্মের উপর আসিয়া পড়িল—মনে হইল যেন ফোটা ফুলে রাত্রির বিদায় অশ্রু জমিয়া আছে। অমিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"চল এখন একটু ঘরে বসি।" এতক্ষণ নানা চিন্তার সমস্যায় কান্তি ব্যথার একটা স্বপ্নে ডুবিয়া ছিল। হঠাৎ দিদিকে সম্মুখে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল,—মাথায় কাপড় সরাইয়া বলিল,—"সে কি চলে গেল? অমিয়া—

অনেকক্ষণ ত অপেক্ষা করে ছিল। শেষটায় চলে গেল।

কান্তি—

কোন কথা বলে গেল না—অমনি চলে গেল।

অমিয়—

শুধু—চোখের জল ফেলে চলে গেল।

হঠাৎ কান্তি চৌকাট ছাড়িয়া উঠিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া কি একটা অমঙ্গলের আশা করিয়া কান্তির পিছন পিছন গেল। দাওয়ায় আসিয়া কান্তি অনেকক্ষণ শূন্যের দিকে তাকাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। সহসা স্তব্ধতার মোহ ভাঙ্গিয়া সেই ভাঁট বনে ঐ যে মানুষের ছায়ার মত দেখা দিল। কে ও? নৃপেন্দ্র। কান্তি নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া সম্বৃত হইয়া বসিল।

নৃপেন্দ্র—

বেশী নয়। দুটি কথা বলে—বিদায় নেব। তার পর আর আমাকে খোঁজ কোরনা।

কান্তি—

এতদিন ত চুপ্ করে ছিলুম। দিলে কই আমায় চুপ্ করে থাক্‌তে ?

নৃপেন্দ্র—

এতদিন পরে আজ এসেচি—মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এসেচি—আজই—আর নয়, তার পর আর দেখা পাবে না।

কান্তি—

কেন—সাত জন্ম ধরে কি এতই পাপ করে ছিলুম যে প্রাণের ভিতর যার জন্যে অগ্নি জ্বেলে বসে আছি—তার দেখাও পাব না—

নৃপেন্দ্র—

যাক্—সে কথা—যা হবার তা হয়েচে—কেশবের বিশ্বাসী এবং প্রেমী হৃদয়ে কোন আঘাত দিও না। তাকে আমি চিনি—কোন সময় সে আমার সহপাঠী ছিল। জীবনে বড় আশা করে আসৃচে বিবাহের

ভিতর দিয়েই সে জগতের সব মঙ্গলকে পাবে। তার জীবনকে যদি বিফল কর তাহলে বড় পাপ্ হবে।

কান্তি—

ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর—এই রকম করে কি আমার সঙ্গে এতদিনের সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করে দেবে।

নৃপেন্দ্র—

কান্তি—যদি সত্যিকার সম্বন্ধ রাখ্তে চাও যদি এই সম্বন্ধ মঙ্গলের বলে নিতে চাও তাহলে—মঙ্গলকেই পূজা কর। তোমার কাজে যদি কোন দিকে অমঙ্গল হয়—সব দিকে অমঙ্গল হবে। কেশবের জীবন যদি অমঙ্গলে নষ্ট হয়—সে অমঙ্গল থেকে আমরা কেউ নিষ্কৃতি পাব না।

কান্তি—

স্পষ্ট করে বল আমি কি কর্ব্ব। এমন করে আর ত পারি না।

নৃপেন্দ্র—

যেটাতে কেশবের জীবনে সব দিকে সফলতা হয়—সতী সাধ্বীর মত তাই কর। তোমায় নিষ্কৃতি দিলুম। এই সম্বন্ধের গৌরব সেইখানে—যেখানে, আমাদের মনে কেবল কল্যাণের শিখা জ্বলবে। কেশবকে ভালবাস। আমার সম্বন্ধ সম্বরণ করে—কেশবকে ভালবাস। তাই যদি সত্য হয় বুঝব আমার জীবনের কল্যাণবিধায়িনী—শুধু মর্ত্তলোকের নারী নয়—অমরার দেবী।

কান্তি—

আশীর্ব্বাদ কর,—আশীর্ব্বাদ কর—তোমার প্রেমের গৌরবে জীবন ধন্য হক।

(৬)

কেশব—

কান্তি—এতদিন পরে দেখ্‌চি—আমার জীবনের প্রতি তোমার একটা টান হয়েচে।

কান্তি—

সে টানের গোড়ায় তোমার টান যে ঢের বেশী,

আমার সব অপরাধ ত ধুয়ে ফেলেচ—

কেশব—

কান্তি—বড় সঙ্কোচ তোমার : কাছে কাছে আছ —তবু ধরা ছোঁয়ায় আস না। কতবার বল্লে অপরাধ—সেই সঙ্গে কতবার তোমার চোখের কানায় কানায় অশ্রু ফুটে ওঠে—তবু সে অপরাধ কি—আজ পর্য্যন্ত বল্লে না :

কান্তি—

আর পারি না—কণ্ঠ জড়িয়ে আসে। তবু আজ বলব। বলার আগে নিবেদন—”

এই বলিয়া অশ্রুজলে কান্তি কেশবের কোলের উপর পাড়য়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি। কেবল কেশবের ঘরে একটি মাত্র বাতি জ্বলিতেছিল।

কেশব স্নেহার্দ্র হইয়া কান্তিকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ওঠ। যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে —এই অশ্রুজলে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।"

কান্তি—

উঃ কি জ্বালা। তোমার পায়ে আমার সব দিয়েছি —মনের সব ঠাঁই তোমার জন্যে—তবু তুমি আমার অপরাধ না জেনে নিলে,—এই মিলনে সংশয় থেকে যাবে। আমার অপরাধ জান— তার পর ইচ্ছে হয় এমনি করে বুকে ঠাঁই দিও— ইচ্ছে হয় পদদলিত করে চলে যেও—কোনটায় আমার অমঙ্গল হবে না।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কান্তি হাত বাক্স হইতে নৃপেন্দ্র সম্বন্ধে নিজের লেখা বিস্তর চিঠি—সেই সঙ্গে নৃপেন্দ্রের শেষ কএকখানি পত্র বাহির করিয়া কেশবের সাম্‌নে রাখিয়া দিল।

* * *

সব কাগচগুলি পড়িয়া কেশবের সুন্দর মুখ কালো হইয়া গেল। উজ্জ্বল চোখের কোলে এক মুহূর্ত্তে কে যেন অনেকটা কালি ঢালিয়া দিল। সেই মরা মূর্ত্তি দেখিয়া কান্তির বুক কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে আতঙ্কে তাহার শরীর হিম হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া রহিল। দ্বিতীয় বার চোক মেলিয়া কেশবের সেই মূর্ত্তি দেখিবার মত সাহস আর রহিল না।

চিঠি গুলি পড়িবার কিছুক্ষণ পরেই কেশব আর কোন দিকে তাকাইল না—আস্তে আস্তে ঘরের কবাট খুলিয়া সেই অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেল। দ্বার ভেজাইয়া যায় নাই। কান্তি টের পাইল কেশব ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিল কিছুক্ষণ পরেই আবার কেশব ফিরিবে। অনেকখানি সময় অতিবাহিত হইয়া গেল তবু কেশব ফিরিল না! কান্তি ভয়ে জড় সড় দেহ লইয়া উঠিল।

ভাল করিয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া সেও ঘরের বাহিরে গেল—সেখানেও ভীষণ অন্ধকার। তখন শ্রাবণ মাস—আকাশে প্রচুর কালো মেঘ। অদূরে এক সার ঝাউবনে শ্রাবনের ভিজে বাতাস সোঁ সোঁ করিতেছে—মাঝে মাঝে আকাশের বক্ষদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ ঝিলিক মারিয়া অন্ধকার রাত্রির বুকে অগ্নির দারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক পশ্লা বৃষ্টিও হইতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কান্তি ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল। আর পারিল না—আতঙ্কে সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—এমন সময় পিছন হইতে ঘরের মধ্যে কে ফস্ করিয়া প্রবেশ করিল। কান্তির সমস্ত দেহে কি যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরিয়া দেখিল ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজা দেখিয়া কান্তির বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এক নিমেষে সমস্ত পৃথিবীটা তাহার কাছে নিতান্তই

"কিছু না" মনে হইল। এত দিনের সমস্যা-পীড়িত মনের উপর হইতে জ্বর ছাড়া ঘামের মত সব বোঝা নামিয়া গেল। বার কএক ভাবিবার চেষ্টা করিল এখন কি করা কর্ত্তব্য, সব সমস্যা অতিক্রম করিয়া মনের ভিতর হইতে উত্তর আসিল "মৃত্যু।"

আঁঠাল গাছের বন জঙ্গল মাড়াইয়া বেশ নির্ভয় চিত্তে কান্তি সম্মুখের দিকে হাঁটিয়া চলিল। পায়ে ভিজা বনের ভিজা ঘাসের ছিন্ন আগাগুলি জড়াইয়া উঠিল; দু একবার বায়ু কম্পিত আঁচলের খুঁট কণ্টকিত মোটাগাছে লাগিয়া গেলেও সে তাহা ছাড়াইয়া ক্রমাগত হাঁটিয়া চলিল। দিঘীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্তিম ব্যবস্থার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একবার ঘাটের সোপানে বসিয়া জীবনের পুরাণ স্মৃতি ভাবিতে বসিল। সে কত ঘটনা। বিদ্যুৎএর চমকের মত একবার নৃপেন্দ্রের স্মৃতি তাহার এই মৃত্যু-আচ্ছন্ন অন্ধকার অন্তরটি আলোকিত করিয়া

তুলিল পরক্ষণেই ব্যর্থতার বিড়ম্বনায় সে হৃদয় গভীরতর কালিমা জড়াইয়া আসিল। কান্তি যেম্নি দিঘীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল অম্নি পিছন হইতে কে তাহাকে টানিয়া ধরিল। বাধা পাইয়া কান্তি পিছনে ফিরিল। পলকে বিদ্যুতের আলোয় চারিদিক আলো হইয়া গেল। সেই আলোয় কান্তি দেখিল তাহাকে বুকের মধ্যে কেশব চাপিয়া ধরিয়াছে।

(৭)

এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কেশব কান্তিকে, ঠিক পূর্ব্বের মত আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কেমন একটা সঙ্কোচের জন্য সে নিজেই তফাতে তফাতে থাকিত। অথচ এই যে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ইহা সংসারে অন্যের কাছে তেমন ভাবে ধরা পড়িল না। যাহারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাদের কাছে ইহা অস্বাভাবিক ঠেকে নাই কারণ বিবাহের পর হইতেই তো কান্তির

ব্যবহার এম্‌নিই ছিল। ক্রমশঃ কান্তি সংসারের সামগ্রীর মধ্যে আপন গৃহিণীপনার দাবী ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে সুরু করিল। কেশব, ভাত-খাইয়াই স্কুলে যাইত, কিন্তু স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকেই আপন জামা কাপড় নিজেই গুছাইয়া লইতে হইত। সহসা কেশবের নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থায় কান্তির নিপুন হাতের স্পর্শ পড়িল।

ঘরের মধ্যে কেশবের চারিদিকের খুঁটিনাটি গোচ গাচের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যবস্থার শ্রী ফুটিয়া উঠিল। ক্রমশঃ সারাদিনের মাষ্টারির পরিশ্রমের পর চারিটার পর গৃহে ফিরিয়া কেশব ভৃত্যকে ডাকাডাকি না করিয়াও মুখ হাত ধুইবার জল সেই সঙ্গে জলখাবারের বস্তুও পাইতে লাগিল।

একদিন কেশব তাহার বড় ভাইয়ের স্ত্রী জ্ঞানদাকে বলিল "বউদিদি, আজ বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে

বিকেলে মটর স্থুটির ঘি-ভাত সেই সঙ্গে আলুর চপ্ খাই।" জ্ঞানদা রাজি হইলেন। কিন্তু বারটা বাজিয়া একটা না বাজিতেই কম্প দিয়া ম্যালেরিয়ার ভূত জ্ঞানদার ঘাড়ে এমনি চাপিয়া বসিল যে তাঁহাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। যথা সময় এই খবরটা সহজেই কেশবলাল শুনিলেন। লালমোহন, জ্ঞানদার ছোট ছেলে তাহার কাকাকে এই সংবাদটা স্কুলেই শুনাইয়া দিল।

রাত্রিতে গরম ভাত সেই সঙ্গে মাছের ঝোল কিম্বা ঐ শ্রেণীর কোন ব্যঞ্জনের আশায় কেশবলাল আসনে বসিয়া আছে এমন সময় রেণুকা কেশবের মাসীর মধ্যম কন্যা একটি থালায় মটর স্থুটির ঘি-ভাত সেই সঙ্গে খান চারেক আলুর চপ্ এবং উপরন্তু ফুল-কপির চাট্‌নি এই কএকটি জিনিষ সাজাইয়া আনিয়া, কেশবের সাম্‌নে রাখিয়া দিল। অবাক হইয়া কেশব বলিল "বউদি ত জ্বরে পড়েছেন এ সব কেমন করে হল" ?

রেণুকা—

যে বউদি জ্বরে পড়েন নি এ রান্না তাঁরি খেয়ে দেখ ভারি চমৎকার হয়েছে। আমি চেকেচি।

কেশবলাল সে দিন বাস্তবিক অনেকটা তৃপ্তি পাইল। আহার শেষ করিয়া ঘরে গিয়া দেখিল শুইবার বিছানায় মাথার বালিশের ডান দিকে একটি পানের ডিবায় কএকটি পান সাজান আছে। এই রকম ভাবে কেশবলালের নিজের উঠিবার বসিবার কক্ষ দিনে দিনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবারে ঠিক মধ্যাহ্নে কেশব তাহার হাত বাক্সের ভিতর হইতে পাঁচ টাকা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে এই লইয়া বাড়ীর চাকর বাকর সেই সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপর একটু চোক রাঙ্গাইতেই ফস্ করিয়া কান্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ওটাকা আমি নিয়েছি। ওপাড়ার কলু বউ যে আমাদের বাড়ী তেল দেয় তার বউ অন্তঃসত্ত্বা

তাই সাধে দিয়েছি।” কান্তির কথা শেষ হইতেই পাশের ঘর হইতে জ্ঞানদা মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, “নবাবের বিটির নবাবী দেখ—নিজের ভাত কোথায় তার নাই খোঁজ কলুর বউর সাধে আবার টাকা দেয়, দিনকে দিন নানা দিক্ দিয়ে কেবল গিন্নিপনা চাগিয়ে উঠেছে। কেন আমরা কি সব ভেসে এসেছি যে, টাকায় হাত না দিয়েও চোক রাঙ্গানি দেখব।”

কেশবলাল বউদির এত চড়া মেজাজ দেখিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কান্তি মাথায় কাপড় টানিয়া কোন কথা না বলিয়া রান্না ঘরে গিয়া শীল নোড়া লইয়া বাটনা বাটিতে বসিল। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে বড় বউ ছোট বউর, দোষ বাহির করিতে পারিলে আর ছাড়িতেন না। কান্তির এতদিনের স্বামীর সঙ্গে তেমন বনি বনাও না

হওয়া সত্ত্বেও কান্তির উপদ্রবকে কেশব নিত্য অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে এই কথা জ্ঞানদা যখন তখন পাড়া ময় রাষ্ট্র করিতে লাগিল। জ্ঞানদার এই ব্যাপার দেখিয়া একদিন কেশবলাল বলিল—

"বউদিদি, ব্যাপার কিছুই বুঝি না। কান্তি যত দিন আপন মনে মুখ গুঁজে ঘরে বসে থাকতো তত দিন তোমরা ওর শত দোষ দেখেও এমন পাড়া মাতাওনি। যখন সে ঘরের কাজে মন দিল অম্নি তার সাবেকী দোষ ধরে এত বাক্য জাল বিনিয়ে ফল কি ?"

জ্ঞানদা—

ঠাকুর পো, থাক আমরা কিছু বলব না। বউ নিয়ে সুখে থাক তাইত চাই। আমরা লেখা পড়া শিখিনি মুরুব্বু—কেবল পরের দোষ ধরে বেড়াই। এই মুখ বন্ধ কল্লুম যা তোমাদের ইচ্ছে তাই কর। বিধবা হয়েচি নইলে আলাদা

হয়ে যেতুম। এমন করে ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকতুম না,—কপাল আমার! ছোট বউ রাণী হয়ে থাক। দাসীর মত হয়েও যেন দুই বেলা চারটি খেতে পাই এইটুকু দৃষ্টি রেখো।

বউদিদির এই কথায় কেশবলাল যেমন দুঃখিত হইল তেমনি বিরক্ত হইল। আর কোন জবাব না দিয়া আপনার শুইবার ঘরে যাইয়া বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া কপালের উপর দুই হাত ভাঁজ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

(৮)

কেশব—

কান্তি, তোমার সঙ্গে মিলন হল খুব সমস্যার পর।

কান্তি—

আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে আমায় আজ বুকের কাছে নিলে আমিও নিঃসংশয় হলুম। মনের সব ময়লা ত তুমিই ধুয়ে মুছে দিলে।

কেশব—

তোমার মনের সব ময়লা ধুয়ে সব অমঙ্গলের উপরে তোমায় তুলেচে নৃপেন্দ্র। তাই এত ধাক্কার ভিতর দিয়ে তোমার নারী জীবনের অমৃত ধারায় আমায় ভিজিয়েচ

কান্তি—

তোমার কাছে আর ত কিছু গোপন নেই তুমি ত সবই জান। সে যে আলো আমায় দিয়েছে, তাতে করেই তো তোমার এমন সত্য মূর্ত্তির দেখা পেলুম। সে ছিল বলেই তো, আজ তোমার কাছে এমন করে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আপনার ভিতর বাহির উদ্‌ঘাটিত করে ধরা পড়েছি।

কেশব—

সত্যি বলেছ কান্তি, আমাদের দুজনার প্রণয় রাজ্যে সে সত্যিকার পুরোহিত। সে যে রাখী বেঁধে দিলে তাতে আমরা বন্দী।

কান্তি—

কি ভাবে তার দিকে এগিয়ে ছিলাম আর কি ভাবেই সে আমায় কোন রাজ্যে এনে পৌঁছে দিলে !

কেশব—

ঐই ত মানুষ। দেখিয়ে দিলে নিজের জীবনে ভোগাতীত প্রেম কেমন শুভ্র, কেমন উজ্জ্বল।

কান্তি—

তোমার মধ্যে আমায় সেই তো ডুবিয়েছে।

কেশব—

সে আমাদের দুজনারই পূজার পাত্র। সে ছিল তাইত প্রেমের আলো এমন করে দেখ্‌লুম।

কান্তি—

যাক্ সে কথা। দাও আমায় সেই অবকাশ, যেটাতে তোমার সংসারে নিজের সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে কাজ কর্ত্তে পারি।

কেশব—

বউদি বিধবা। তিনি যতই অন্যায় করুন তবু তাঁকে যেন কোন রকমে আঘাত করো না। সুখে দুঃখে তাঁকে আমাদেরই মধ্যে রাখতে হবে; দাদা আমায় পিতার মত স্নেহ করেচেন।

কান্তি—

আমার জীবনের ব্যক্তিগত সমস্ত শান্তি চুলোয় যাক কোন ক্ষতি নেই তাতে। কিন্তু সংসারে যেখানে, অকারণ তোমার উপর বজ্র পড়বে— সেখানেও কি বুক পেতে দাঁড়াবার অধিকার আমার নেই?

কেশব—

সে অধিকার ত সকল সতীরই আছে।

কান্তি—

ঐ যে অন্ধ মেয়েটা না দেখে কাল বড়দির ছেলের দুধ ফেলে দিলে সে জন্যে কি তার উপরে

ঝ্যাঁটা চালানোটা ঠিক হয়েচে। না হয় ও ঝির পেটের মেয়ে তবুও ত সে মানুষ; আমাদের মত ঐ অন্ধ বেচারীরও ত শরীর রক্ত এবং মাংসে গড়া। এর জন্যে শুধু বলেছিলাম "বেচারী অনাথা, ওকে মেরে কোন পুণ্য হবে।" তাই এই দুদিন ভাতই খেলেন না।

কেশব—

এরকমের অনেক দোষ আছে বউদির তবু বলি সব দোষের প্রতিবাদ করো তবু তাঁকে স্বেচ্ছায় কোন রকমের অন্যায় কষ্ট দিও না।

কান্তি—

স্বেচ্ছায় কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়, তা কখনো দেব না। যিনি তোমার শ্রদ্ধার পাত্রী তাঁকে আমারো শ্রদ্ধা করা উচিত জানি তবু যদি অসাবধানে কোন ভুল হয় ক্ষমা করে নিও।

এমন সময় রেণুকা আসিয়া বলিল,"বড় বোঠান

ছোট বোঠানকে ডাক্‌চেন।" কান্তি তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া, স্বামীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জ্ঞানদার ঘরে ঢুকিতেই ঠেকার করিয়া জ্ঞানদা বলিলেন "বাড়ীর গিন্নি হয়েচ তায়ে আবার ধার্ম্মিক পেরাণ! দোর গোড়ায় ভিকিরি, দান কর! আমরা সব নিষ্ঠুর। (ভিখারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ওগো, এই মা ঠাকরুণ বড় দাতা, অঁর কাছে ভিক্ষে চাও টাকা কাপড় পাবে।" জ্ঞানদার এই কথা কান্তির বুকে শেলের মত বিঁধিল, তবু স্বামীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া সে কোন কথা বলিল না। মনের সমস্ত ক্রোধকে, দাঁতে ঠোঁটে কামড়াইয়া চাপিয়া রাখিল।

এই রকম করিয়া জ্ঞানদা যখন তখন ঠেলেস দিয়া কান্তির বুকে আঁচড় টানিয়া টানিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। কান্তি সে সব উপদ্রব সহিয়া যাইতে লাগিল। জ্ঞানদা ফাঁক খুঁজিতেছিলেন যে

রাগের মাথায় কান্তি জ্ঞানদাকে দুই কথা শুনাইয়া দিক। সেই কথা লইয়া পাড়ায় নাকি কান্না কাঁদিয়া ছোট বউর বদনাম কের্ত্তন করিবেন। যখন দেখিলেন জ্ঞানদার কোন কথায় কান্তি পালটা জবাব না দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কাজই করিয়া যাইতেছেন তখন আর তাঁর সহ্য হইল না। আপন বিষে জর্জ্জরিত সর্পের ন্যায় একদিন জ্ঞানদা হঠাৎ কেশবের সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন "কুলটার সংসারে আমি থাকিতে পারিব না।" কেশব এই কথায় চিত্ত সংযম হারাইয়া বলিল "বউদিদি, সবটারই একটা সীমা আছে তোমার স্বভাবটার মধ্যে পূর্ব্বে, যে মাতৃত্ব ছিল দিনে দিনে সব এখন লোপ পাইতেছে।

জ্ঞানদা—

ঠাকুর পো, উপদেশ শুন্‌তে আসিনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

ইচ্ছে হয় যেতে পার। আমি যেতে বলতে

পারি না।" এই বলিয়া কেশব ঘরের বাহির হইয়া পাড়ার কোন এক বন্ধুর বাসায় চলিয়া গেল। এদিকে জ্ঞানদা উঠানে বসিয়া নাকি কান্নায় বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিলেন। কান্তি একবার ভাবিল জ্ঞানদাকে বুঝাইয়া বলে, পরক্ষণে ভাবিল "থাক দরকার নাই হয় ত মুখ ঝামটা দিয়া কি আবার বলিয়া উঠিবেন। এই ভাবিয়া কান্তি রান্নাঘরে ঢুকিয়া কি একটা ভাজিতে বসিল। এমন সময় জ্ঞানদার ছেলে সেই রান্নাঘরের দরজার চৌকাটের সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া বলিল "কাকীমা ক্ষিদে পেয়েচে।" স্বামীর জন্য কিছু মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া একটি ছোট কাঁশার রেকাবীতে কান্তি রাখিয়াছিলেন; সেই মোহনভোগ ভাসুর পোর হাতে দিয়া কান্তি বলিল "এই নাও।" জ্ঞানদা এই দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন। "খাস্‌নে ওরে হতচ্ছাড়া ছোড়া খাস্‌নে, ওর হাতের খাবার আর

খাস্‌নে জাত মানের ভয় ঠাকুর পোর না থাক আমার আছে।" ছেলে মার এই কথা শুনিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। কান্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া— উনানের নিকট হইতে উঠিয়া-আসিয়া লালমোহনের হাত হইতে মোহনভোগের বাটী কাড়িয়া লইয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলো "খাস্‌নে, ফের যদি আমার কাছে খাবার চাইতে আসিস্ ত টের পাবি।" কাকী মার এই কঠিন বাক্যে লালমোহন কাঁদিয়া ফেলিল।

রাত্রিতে যখন কেশব বাড়িতে ফিরিল তখন কান্তি নিজের শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতে ছিল। অন্যদিকে জ্ঞানদা, জিনিষ পত্র গুছাইয়া হা-হুতাশ করিতেছিলেন। রেণুকা কেশবকে সব ঘটনা খুলিয়া বলিতেই কেশব রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক সেই ক্রোধের সময় জ্ঞানদা, কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ঠাকুর পো, বাপের বাড়ী

পাঠাতে মন সরে না সেকি ছোট বউর অনুগ্রহে রাখার জন্য ? বাছা আমার ক্ষিদের জ্বালায় একটু খাবার চাইলে অম্নি হাতের থেকে খাবার কেড়ে নিলে গো—বলি আমাদের কি স্বামী ছিল না। বিয়ে কি কেবল তোমরাই করেচ। এ কোন্ রকমের স্বামিভক্তি। যাক কাজ নেই। আমরা আজই চল্লুম, আমার বাপের বাড়ীর লোক এসেছে।"

কেশব—

চল্লে ত চল না। এমন করে হাড় জ্বালানর চেয়ে যাওয়াই ভাল। এমন যন্ত্রণাও তো দেখিনি।

জ্ঞানদা কিছুদিন পিত্রালয়ে গিয়া রহিলেন। কিন্তু আবার নিজের গরজেই ফিরিতে হইল। গোড়ায় ভাবিয়াছিলেন নানা রকম নাকি কান্না আর লাগালাগিতে বুঝি কেশব কান্তিকে পায়ে ঠেলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। অগত্যা ঘুরিয়া সেই ছোট

বউর সংসারেই আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িতে হইল। কান্তির মনে যাই থাকুক সে কিন্তু জ্ঞানদার প্রতি সদ্‌ভাব দেখাইল। যথাযথ সম্মান দেখাইয়া চলিত। মনের অনিচ্ছা স্বত্বেও ধীরে ধীরে জ্ঞানদা দায়ে পড়িয়া ছোট বউর মনের সপক্ষে সব কাজে তাল দিতে লাগিলেন। বিপক্ষে মত দিবার মত সাহস আর রহিল না। অনেক দিনের টানা হ্যাঁচড়া এবং দুঃখ ব্যথার ঝড় ঝাপটির পর কান্তি এখন সংসারে যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(৯)

শ্রাবণের আকাশ মেঘের স্তরে স্তরে ভীষণ কালো রূপ ধরিয়াছে, ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বাড়ীর চারিদিকের বাঁশ আর ভাটবন কাঁপাইয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কান্তি রান্নাঘরে বসিয়া কেশবের ফরমাজ মত প্যাঁজ দিয়া খিচুড়ী উনানের উপর চাপাইয়া

দিয়া উনানের পাশেই একটি বঁটি লইয়া কয়েকটা আলুর খোসা ছাড়াইতেছিল, এমন সময় কেশব সেই রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেশবকে দেখিয়াই কান্তি মাথায় কাপড় টানিয়া বলিল, "অত ব্যস্ত হলে রান্না ভাল হবে না।"

কেশব—

ব্যস্ত হচ্ছি না। আচ্ছা রান্না করে নাও।

কান্তি এতক্ষণ অন্যদিক্ চাহিয়া কথা বলিতেছিল। হঠাৎ স্বামীর মুখে দৃষ্টি পড়ায় দেখিল কেশবের সুন্দর উজ্জ্বল মুখে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মুখে অমন চিন্তার ছায়া কেন, কি হল!" কেশব কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "রান্নার আর দেরী কত?"

কান্তি—

বেশী দেরী নাই আর দশ মিনিটের মধ্যে সব

হয়ে যাবে। ক্যান কি হয়েচে বল না, অমন করে থাক্‌লে ভয় হয় ?

কেশব—

কিছু না। তুমি রেঁধে ন্যাও।

*　　　*　　　*

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে কেশব কান্তিকে জানাইল কলিকাতায় হাঁসপাতালে যে রোগে শয্যাশায়ী হইয়া নৃপেন্দ্র পড়িয়া আছে সে রোগ হইতে বাঁচা দায়। সেখানকার এক ডাক্তার বন্ধু কেশবকে আরো লিখিয়াছেন যে, আর বেশী দিন নৃপেন্দ্র বাঁচিবে না। কান্তির হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রু-জলে ভরিয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়া কত কি ভাবিতেছে এমন সময় কেশব স্ত্রীর পিঠে হাত দিয়া বলিল, “কান্তি, ভেবে আর কোন উপায় নাই। চল আজই রাত্রের গাড়ীতে আমরা কোলকাতায় যাই।

দেখি সেবায় চেষ্টায় কিছু যদি হয়। এ খবর শুনে আর থাক্‌তে পারি না"। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিতেই কান্তির বেদনা-ক্লান্ত অন্তরে অত্যানন্দের ধাক্কা লাগিল—দুঃখের অশ্রুবিন্দু মুহূর্ত্তে আনন্দধারায় প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। এমন প্রেম, এমন স্বামীর সোহাগ, এমন দরদ, কে কল্পনা করিতে পারিত। কান্তি স্বামীর কোলের উপর আছাড় খাইয়া খুব কতকটা অশ্রু ফেলিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "এম্‌নি করে পলে পলে আমায় নির্ম্মল কর, পবিত্র কর।"

রাত্রির গাড়ীতেই কেশব এবং কান্তি কলিকাতায় রওনা হইল। বাড়ীর অন্যান্য লোকের কাছে ইহাদের হঠাৎ কলিকাতা যাওয়ার খবরটা অজানা রহিল। জ্ঞানদা এ সম্বন্ধে কোন রকম কথা ঘাঁটাইলেন না।

* * *

এক সঙ্গে কান্তি ও কেশবকে হাঁস্‌পাতালে দেখিয়া জীর্ণ দেহে নৃপেন্দ্র অনেকটা বল লাভ করিল। কেশব দেখিল নৃপেন্দ্রের চক্ষে হাসির আড়ালে অশ্রু জাগিয়া উঠিয়াছে। কান্তি নৃপেন্দ্রের শীর্ণ কঙ্কাল দেখিয়া বলিল, "এমন অবস্থা আমাদের জানালে না কেন ?"

নৃপেন্দ্র—

যে রোগে পড়েছি এ চিকিৎসা ও সেবার বার, সেই জন্যে কাউকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে নেই। তোমাদের দেখে খুব খুসী হলুম। (কেশবের দিকে ফিরিয়া) ভাই কেশব, ধন্য তোমার হৃদয়। বড় খুসী হয়েচি, আজ তোমাদের এমন মিলন দেখে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাই ক্ষমা চেয়ে যাচ্চি; এই মিলনের মাঝে অনেক দিন কাঁটা হয়ে ছিলাম।

কেশব কিছু বলিতে পারিল না। তাহার দুই

চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কান্তি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "সহরে বাড়ী ভাড়া করেছি সেইখানে থাক্‌বে; হাঁসপাতালে এ অযত্নে তোমার এমন অবস্থা হয়েচে।"

* * *

কোন রকমে একটি মোটরকারে কেশব আর কান্তি নৃপেন্দ্রকে মেও হাঁসপাতাল হইতে সহরের বাড়ীতে লইয়া গেল। এক মাস ধরিয়া কেশব এবং কান্তি নানা রকমে নৃপেন্দ্রের জন্য সেবা করিয়া কত না খাটিল, মৃত্যুর দূত তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে কোনরূপ গ্রাহ্য করিল না। একদিন মধ্যাহ্নে নৃপেন্দ্র চিরদিনের মত চক্ষু মুদিল। মৃত দেহের শয্যার এক পার্শ্বে কেশব, অন্যদিকে কান্তি তখন বসিয়াছিল। যখন ডাক্তার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "সব শেষ হইয়া গেছে"—মুহূর্ত্তের জন্য কান্তি চঞ্চল হইয়া নৃপেন্দ্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িল। পরক্ষণে স্থির হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া স্বামীর দিকে চোখ তুলিয়া বলিল—"এখন কি ব্যবস্থা কর্বে?" কেশব বাষ্প-আপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "মদন (কেশবের বন্ধু) যা হয় কর্বে। চল আমরা পাশের ঘরে যাই।"

মাথায় কাপড় টানিয়া কান্তি স্বামীর পিছন পিছন পাশের ঘরে চলিল।

সমাপ্ত